রেখায় রেখায়

প্রভাতী দাস

গ্রন্থতীর্থ
প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা
৬৫/৩এ, কলেজ স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

লেখিকার কথা

সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলে শিক্ষকতা করার সময় আমার সহকর্মীদের মধ্যে অনেকেই আমাকে একটি আলপনার নকশার বই বার করবার কথা বলতেন। তখন কথাটাকে তেমন গুরুত্ব দিইনি। আসলে ইশকুলের ছোটো ছোটো মেয়েদের শিখিয়েই মনটা ভরে থাকত। তবে হয়তো ওদের কথাটা মনের কোন গভীরে একটা জায়গা করে নিয়েছিল যেটা তখন ঠিক উপলব্ধি করিনি। অবসর গ্রহণের পর কন্যা সায়ন্তনীর তাগিদে ঘরে বসে আলপনার নকশা করতাম। গৃহস্থালী কাজের ফাঁকে ঘরের এ কোণে ও কোণে কখনো সখনো গোলা দিয়ে আলপনা দিয়েছি — ওই পর্যন্ত। কখন যে ও ব্যাপারে ঢিলেমি এসে গিয়েছিল তা বলতে পারিনা। ইতিমধ্যে আমার পুত্র সিদ্ধার্থ ও পুত্রবধূ শুক্লা প্রকাশকের সঙ্গে যোগাযোগ করে আলপনার নকশার একটা বই বার করার ব্যবস্থা করে ফেলেছে, এর পরের সব কাজই শুক্লা তার হাতে তুলে নিল। আমার আলপনার খাতা থেকে নকশা বেছে ট্রেস করেছে, রং দিয়েছে। এরই মধ্যে আমাকে দিয়ে আলপনা নিয়ে কিছু কথা লিখিয়ে নিয়েছে। নকশার সঙ্গে লেখাটিকেও গেঁথে দেওয়া হল। নকশাগুলি কারো কাজে লাগলে বইটি প্রকাশ করা সার্থক হবে। সেই সঙ্গে বলে রাখি সার্থকতার সিংহভাগই শুক্লার প্রাপ্য।

আমার দুই ছাত্রী কবিতা এবং নমিতা অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে পুনশ্চ প্রকাশনার সঙ্গে যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের প্রতি জানাই আমার অকৃত্রিম স্নেহ। প্রকাশক শ্রী সন্দীপ নায়ক বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

প্রভাতী দাস

সৃষ্টির আগ্রহ মানুষের সেই আদিম যুগ থেকেই। সেই তাগিদেই গুহাবাসী মানুষ চিত্রিত করে তুলত প্রকৃতি নির্মিত তার পাথরের আশ্রয়। অনার্যযুগের মানুষ সেই চেতনা নিয়েই কাঁচামাটির দেওয়ালগুলি নানারঙের চিত্রণে ভরিয়ে তুলত। তারপর ক্রমে মানুষ গড়ল সমাজ। উদ্দাম-উচ্ছৃঙ্খল জীবন হল সংহত; কমল উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ। কোনো কিছুকে উপলক্ষ করে শুরু হল উৎসব, অনুষ্ঠান। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টোলে সব দেশেই দেখা যায় এমনটাই ঘটেছে। ভারতে তথা বাংলাতেও দেখি উৎসবের দিনে উৎসবের স্থানটিকে সুন্দরতর করে তুলতে এগিয়ে এসেছে ঘরের বধূরা, কন্যারা। তাদের সহজাত শিল্পপ্রতিভা উৎসবের উদ্দেশ্য বুঝে, স্থান বুঝে বিভিন্ন নকশায় এনে দিত সুন্দরের স্পর্শ। প্রাচীনকালে আলপনা দেবার যে প্রথা ছিল তার কিছুটা বিবরণ পাওয়া যায় বাণভট্টের কাদম্বরী গ্রন্থে। রাজপুত্র চন্দ্রাপীড়ের জন্ম উপলক্ষে পুরস্ত্রীদের কাজের বিরাম নেই। কেউ আঁকছে স্বস্তিক গোময় পাত্রের ওপর বড়ো বড়ো কড়ি বসিয়ে, ফাঁকে ফাঁকে দিচ্ছে কাপাস ফুল। আর কুসুম্ভি ফুলের রক্তরেণু দিয়ে এঁকে চলেছে স্বস্তিক চিহ্ন— এমনি আরো বর্ণনা। ময়মনসিংহ গীতিকার 'কাজল রেখা' কাহিনিতে আলপনার একটি সুন্দর বর্ণনা আছে—

"লক্ষ্মী কুজাগরের রাত্র। মন্ত্রীর কথামত রাজা রানি ও দাসীকে আলপনা আঁকতে কইল।" রাজা বললেন, "আলপনা যে যত সুন্দর কইরা পার আঁইক্য।"

কাজলরেখা আঁকল—

"উত্তম সাইলের চাউল জলেতে ভিজাইয়া।
ধুইয়া মুছিয়া কন্যা লইল বাটিয়া।।
পিটালি করিয়া কন্যা পরথমে আঁকিল।
বাপ আর মায়ের চরণ মনে গাঁথা ছিল।।
জোড়া টাইল আঁকে কন্যা আর ধানছড়া।
মাঝে মাঝে আঁকে কন্যা গিরলক্ষ্মীর পারা।"

দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের 'ঠাকুরমার ঝুলি'-তেও একইরকমই একটি বর্ণনা আছে।

'আলপনা' শব্দটি দেশজ শব্দ 'আইলপনা' থেকে কি দেবভাষা 'আলিম্পন' থেকে উদ্ভূত সে তর্কে আমি যেতে চাই না, আমার কথা আলপনা ভারতীয় তথা বাংলার এই লোকশিল্পটি আমাদের একেবারে প্রাণের জিনিস। বাংলার বিভিন্ন ব্রত অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই শিল্প অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ব্রত হল মনস্কামনার স্বরূপটি আলপনায় তার প্রতচ্ছবি, গীতে বা ছড়ায় তার প্রতিধ্বনি।' বাংলা বারোমাসে তের পার্বণের দেশ। ঘরের মানুষ, প্রতিবেশী, প্রবাসী আত্মীয়জনের কল্যাণে কত পূজা, কত ব্রত, কত পার্বণের

আয়োজন। তারই এক বিশেষ অঙ্গ আলপনা। পাশ্চাত্য সভ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে দীর্ঘদিন আমরা এই লোকশিল্পটি সম্পর্কে উদাসীন ছিলাম। কিন্তু এখন আবার আমরা এর কদর বুঝতে পেরেছি তাই উৎসবে অনুষ্ঠানে আলপনা দেওয়ার রেওয়াজ বেড়েছে। শিল্প-গুরু অবনীন্দ্রনাথ আমাদের দৃষ্টি এদিকে ফেরালেন। শুধু পূজাপার্বণ, সামাজিক অনুষ্ঠান নয়, জন্মোৎসব, সাহিত্য বাসর, সংগীত সম্মেলন সর্বত্র এখন আলপনা দেবার রীতি প্রচলিত হয়েছে। এমনকি প্রিয়জন অথবা স্মরণীয় ব্যক্তির মৃত্যু উপলক্ষে যে স্মৃতিসভার আয়োজন রয়েছে সে স্থানটিকে সুন্দর ও শোভন করে তুলতে আজ ডাক পড়েছে আলপনার। এতে মৃত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন সার্থক হয়ে ওঠে।

আলপনা শিল্পটির পুনরুজ্জীবনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম। তিনি ছিলেন সৌন্দর্যের পূজারি। যে কোনো কাজে সৌন্দর্যের ছোঁয়াটি থাকত। দৈনন্দিন জীবনকে সুন্দর করে তুলবার কথা বারবার বলেছেন। আপাততুচ্ছ ঘটনাকেও যে সুন্দরের স্পর্শে বিশিষ্টতা দান করা যায় এ-ও তাঁর শিক্ষারই অঙ্গ। শান্তিনিকেতনে দেখেছি সৌন্দর্যের আরাধনা নিত্যদিনের। সেখানে ঋতুতে ঋতুতে উৎসব। মনে পড়ে নববর্ষে মন্দিরে পাথরের মেঝেতে চক-খড়ি গুড়োর শুভ্র আলপনা। ওদিকে আম্রকুঞ্জে যেখানে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালিত হয়, সেখানে মাটিতে রংবেরং-এর আলপনা আঁকা হয়ে গেছে আগের দিনই। বৃক্ষরোপণ, হলকর্ষণ, বসন্তোৎসব, পৌষের উৎসবে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আলপনা। শিল্পাচার্য নন্দলাল বোসের কথা এ প্রসঙ্গে মনে না এসে যায় না। তাঁর নির্দেশে কলা ভবনের ছাত্রছাত্রীরা উৎসবের স্থানটি বিভিন্ন নকশায় চিত্রিত করে তুলেছেন। আরো পরে দেখেছি শ্রদ্ধেয়া গৌরীদি (গৌরী ভঞ্জ), যমুনদি (যমুনা সেন) কলাভবনের ছেলেমেয়ের দল নিয়ে অনুষ্ঠানের জায়গাগুলিতে আলপনা দিচ্ছেন। আমরা কৌতূহলী খুদের দল এক ক্লাস থেকে আর এক ক্লাসে যাবার ফাঁকে দাঁড়িয়ে গেছি। মুগ্ধ হয়ে দেখছি হাতের নিপুণ টানে কী আশ্চর্য সুন্দর শিল্প সৃষ্টি হয়ে চলেছে, বছরের পর বছর পার হয়েছে, বড়ো হয়েছি কিন্তু উৎসবের আগের দিনের সেই আলপনা দেখার মুগ্ধতা কাটেনি। তারপর নিজেও একদিন কলা ভবনের কারুশিল্প -এর ক্লাসে যোগ দিয়েছি। অনভ্যস্ত, অপটু হাতের আঁকাবাঁকা লাইন স্নেহময়ী যমুনাদির সুনিপুণ নির্দেশনায় কিছুটা আয়ত্তে এল। তখন আমিও ভিড়লাম উৎসবের আঙিনায় আলপনা দিতে। ছাত্রজীবন সমাধা করে সরিষা রামকৃষ্ণ মিশন সারদা মন্দির ইস্কুলে যোগ দিলাম। বিভিন্ন উৎসবে বা বিশিষ্ট কারো আগমন উপলক্ষে আলপনা দিয়েছি অন্য শিক্ষিকাদের সঙ্গে নিয়ে। সিস্টার নিবেদিতা স্কুলে যখন যোগ দিলাম তখন আলপনা দেবার এবং শেখানোর সুযোগ আরো বেশি পাওয়া গেল। ভারতীয় শিল্পের নবজাগরণের ক্ষেত্রে সিস্টার নিবেদিতার অবদান আজ সর্বজনবিদিত। ভারতীয় তথা বাঙালি মেয়েদের ভিতরকার নিভে আসা সেই স্বভাবসুলভ শিল্পপ্রতিভাকে আবার জ্বালিয়ে

তোলায় তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না। তাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে অঙ্কন, সূচিশিল্প আবশ্যিক বিষয়ের অন্তর্গত। একটি বিশেষ শ্রেণির জন্য আলপনার ক্লাসের ব্যবস্থা ছিল। যেমন করে শ্রদ্ধেয়া গৌরীদি যমুনাদির কাছে আলপনা বিষয়ে নানা কথা জেনেছি তেমনি করেই আমিও আমার ছাত্রীদের শেখাবার চেষ্টা করেছি। সরস্বতী পুজো, স্বাধীনতা দিবস প্রভৃতি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ছাত্রীদের নিয়ে মেতে উঠেছি আলপনা দেওয়ায়। সবাই মিলে কেউ দড়ির সাহায্যে গোল আঁকছে, কেউ কেউ দড়িতে চক ঘষে সোজা লাইন টানায় ব্যস্ত, আবার অন্যরা বিভিন্ন বাটিতে আলপনার গোলা তৈরি করছে। আচার্য নন্দলাল বসুর ভাষায় ছাত্রশিক্ষক মিলে কাজ করেছি, কে শিক্ষক কে ছাত্র ভুলে গিয়ে।

এবার আসি কাজের কথায়। যে কোনো কাজ শুরুর আগে জমি প্রস্তুত করে নিতে হয়। আলপনা দেবার আগেও সে কথাটি ভুললে চলবে না। ঘরের মেঝেতে আলপনার আগে স্থানটি ভালো করে ধুলো ঝেড়ে জল ন্যাকড়া দিয়ে মুছে নিতে হয়। যদি মাটির ওপর অর্থাৎ উঠোনে বা প্রাঙ্গণে আলপনা দিতে হয় তবে দিন দুই আগে ঘাস অথবা খুদে চারা গাছ থাকলে তা নির্মমভাবে তুলে ফেলে ঝাঁট দিয়ে গোবর-মাটি দিয়ে নিকিয়ে নিতে হয়। ভালো করে শুকিয়ে যাবার পর আলপনা দিতে হয়।

শান্তিনিকেতনে আসার প্রথম যুগে দেখেছি বৃক্ষরোপণ; হলকর্ষণ উৎসবে চাল, ডাল, কালোজিরে ইত্যাদি বিভিন্ন রকম এবং রঙের শস্য দিয়ে আলপনা। পরে শস্যের পরিবর্তে গুড়ো রঙের আলপনার ব্যবস্থা হয়। এখানে জমি তৈরির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নরকম। মাটি থেকে ঘাস ভালো করে চেঁছে তুলে ফেলে ইঞ্চি দুই মতো উঁচু বালির বেদি তৈরি করা হয়। এবং সরু কাঠির সাহায্যে আলতো হাতে বালির ওপর নকশা আঁকতে হয়। এরপর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ; তর্জমা ও মধ্যমা এই তিন আঙুলের সাহায্যে গুড়ো রং নিয়ে নকশা অনুসারে আলপনা দিতে হয়। গুড়ো রং যাতে হাওয়ায় উড়ে না যায় সে জন্য এক ভাগ বালি এবং দুভাগ গুড়ো রং মিশিয়ে নিতে হয়। এই আলপনা খুব সুন্দর। অনেকেই জানেন দক্ষিণ ভারতে গুড়ো রঙের আলপনার প্রচলন খুব বেশি। ওদেশে গৃহস্থ বাড়িতে নিত্য আলপনা দেবার প্রথা। সময় সংক্ষেপ হেতু ওঁরা একটি বিশেষ ধাতব চোঙের ব্যবহার করেন। চোঙের গায়ে ছিদ্রের মাধ্যমে নকশা করা থাকে। ভিতরে গুড়ো রং ভরে চোঙটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলপনা দেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে পূজা-পার্বণে পঞ্চগুড়ির আলপনার কথা না বললে বক্তব্য সম্পূর্ণ হবে না। গঙ্গামাটি দিয়ে সমান চতুষ্কোণ একটি বেদি তৈরি করে তার উপর পঞ্চগুড়ি যথা আতপচাল গুড়ো, হলুদ গুড়ো, শুকনো বেলপাতার গুড়ো, কাঠকয়লা গুড়ো এবং সিঁদুর দিয়ে আশ্চর্য সুন্দর আলপনাটি নিঃসন্দেহে পূজাস্থানের পবিত্রতা এবং সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে। নিবেদিতা স্কুলে সরস্বতী পূজার আগের দিন এই আলপনা দেওয়া প্রতিবছর অত্যন্ত আগ্রহ ভরে দেখেছি।

জমি প্রস্তুত হল, এবার আলপনা দেবার পালা। শুরুতে কী কী উপকরণ আবশ্যক তা বলে নেওয়া যেতে পারে। সাদা আলপনার ক্ষেত্রে আতপচাল বাটা দিয়ে তৈরি গোলা বা পিটুলি গোলা অথবা চকখড়ি গুড়ো (whiting) এর গোলা। পূজাস্থানে আজও অনেকে চালবাটা ভিন্ন অন্য গোলা ব্যবহার করেন না। এই প্রসঙ্গে বলি whiting অনেক কম মূল্যে পাওয়া যায় এবং আলপনা দেবার ক্ষেত্রেও তা অনেক সুবিধের। কেউ কেউ জিঙ্ক অক্সাইড ব্যবহার করেন কিন্তু তাতে সহজে জল কাটে আর তা বড্ড ফ্যাটফ্যাটে সাদা। অবশ্য সামান্য গঁদের আঠা মিশিয়ে নিলে জল কাটা বন্ধ হতে পারে। রঙিন আলপনার ক্ষেত্রে সাদা রং তো অবশ্য প্রয়োজন, তা ভিন্ন এলামাটি, গিরি/গেরি মাটি, পিউরি ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এসবই হার্ডওয়্যার-এর দোকানে স্বল্পমূল্যে পাওয়া যাবে। এক্ষেত্রে বলি এর একটি রং-এর সঙ্গে আর একটি রং মিশিয়েও নতুন রং করা যায়। তবে মনে রাখতে হবে ব্যবহারের সময় প্রতিবার রংটি খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে।

পূর্বেই বলেছি আলপনার স্থানটি ভালো করে মুছে নিতে হবে এবার চকের সাহায্যে একটি নকশা মোটামুটি এঁকে নিতে হবে। এবার রং গোলার কাজ। একটি পাত্রে whiting পরিমাণ মত জলে গুলতে হবে। খুব পাতলা বা খুব ঘনও হবে না। অতিরিক্ত পাতলা হলে জল কাটবে আবার অতিরিক্ত ঘন হলে রং শুকিয়ে গেলে তা ফেটে ফেটে উঠে যেতে চাইবে। রঙিন আলপনা হলে বিভিন্ন পাত্রে বিভিন্ন রং একইভাবে গুলে নিতে হবে। প্রতিটি পাত্রের জন্য পৃথক কাপড়ের টুকরো থাকবে। আমি আমাদের প্রাচীন রীতি অনুসারে হাতে আলপনা দেবার রীতির কথাই বলছি। আজকাল অনেকেই তুলি দিয়ে আলপনা দেন। যাইহোক পরিষ্কার পুরোনো সুতির কাপড়ের টুকরো সোজা কথায় ন্যাকড়া গোলায় ভালো করে ডুবিয়ে নিয়ে হাতে রেখে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়ে মৃদু চাপ দিলেই ফোঁটা ফোঁটা রঙ অনামিকার ডগায় চলে আসবে, আর ঐ আঙুলের সাহায্যে নকশার উপর দিয়ে এঁকে গেলেই সুন্দর আলপনা ফুটে উঠবে। রঙিন আলপনা হলে আগে থেকে ভেবে রাখতে হবে কোথায় সাদা, কোথায় বা অন্য রং দেওয়া হবে। অভ্যস্ত হয়ে গেলে আলপনা দিতে দিতেই শিল্পী ঠিক করতে পারবেন কোথায় কী রং হলে ভালো লাগবে। এখানে মনে রাখতে হবে রং বদলের সময় হাত ধুয়ে নেওয়া প্রয়োজন। আর একটি বিষয়েও শিল্পীকে সতর্ক থাকতে হবে। আলপনার ক্ষেত্রে যেন এক রং-এর গায়ে অন্য রং না লাগে, তাহলে রং মিলেমিশে একটু অপরিচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। একটি রং শুকিয়ে গেলে অন্য রং লাগলে কিছু অসুবিধা হবে না।

আলপনা প্রসঙ্গে ফুলের আলপনার কথা না বললে বোধহয় একটু অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে। হাতে অল্প সময় থাকলে বা সহসা রং-এর ব্যবস্থা করা না গেলে ফুল দিয়ে আলপনা দেওয়া যায়। ঝুরো ফুল, কখনো ফুলের

পাপড়ি, কুঁড়ি, বোঁটা এমনকি পাতা দিয়েও খুব দ্রুত অথচ সুন্দর আলপনা হতে পারে। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা বলবার লোভ সামলাতে পারছি না। একবার শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসবের দিনে বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে আমরা যথারীতি বালির উপর আলপনা সাঙ্গ করে বাড়ি ফিরব, সেইসময় নামল তুমুল বৃষ্টি। মুহূর্তে আলপনা গেল ধুয়ে। বৃষ্টি থামল। কী করা যায়। আমাদের মাস্টারমশায় শ্রদ্ধেয় ননীদা (শ্রীযুক্ত ননীগোপাল ঘোষ) ছেলেদের কদমফুল সংগ্রহ করে আনতে বললেন। ফুল সংগ্রহ হল; আমরা ননীদার নির্দেশমতো ত্বরিত হস্তে বালির বেদি যতটা সম্ভব ঠিক করে কদম ফুল দিয়ে নতুন আলপনা করে ফেললাম। এর আর এক সৌন্দর্য।

একসময় এই আলপনা শিল্প একান্তই মেয়েদের শিল্প বলে পরিচিত ছিল। ভাবতে আশ্চর্য লাগে তখন না শিখেই কত অনায়াসে কত সুন্দর জিনিস তাঁরা এঁকেছেন। আজও সে ধারা চলেছে। একেক অনুষ্ঠানে একেক রকম নকশা। আলপনা লক্ষ্মীপূজার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এই দিনের আলপনার প্রধান অঙ্গ হল বিচিত্ররকম পদ্ম, পদ্মলতা, ধানছড়া, লক্ষ্মীপেঁচা আর লক্ষ্মীর পাড়া বা পদচিহ্ন। মাঘমণ্ডলে-র ব্রতে গোলা নয় গুড়ো রং দিয়ে আলপনা। এই ব্রতের আলপনা মণ্ডলাকার হয়। বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি বাঙালি রঙিন আলপনায় উজ্জ্বল করে তোলে। মাছ মঙ্গল চিহ্নরূপে বিবেচিত। তাই বিশেষ করে বিবাহের আলপনায় মাছ একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

আলপনার নকশায় শিল্পাচার্য নন্দলাল এনে দিলেন নতুনত্ব। সেই পদ্ম, সেই মাছ, সেই লতা নকশার প্রধান অঙ্গ তবু এগুলিকেই একটি বিশেষ আকৃতির বন্ধনের মধ্যে এনে একেবারে নতুন রূপে উপস্থাপন করলেন। প্রকৃতির থেকে নকশার অঙ্গগুলি নেওয়া। কলা ভবনের ছাত্রী অবস্থায় বারেবারেই শুনেছি 'প্রকৃতির দিকে তাকাও নকশা আঁকতে ভাবতে হবে না।' পাতার ভঙ্গিমা, ফুলের পাপড়ির বঙ্কিম ভঙ্গিটুকু, ফুলের কেশর, কখনো লতার সহজ গতি আমাদের নকশা আঁকতে সাহায্য করে।

আলপনা বিভিন্ন আকৃতির হতে পারে যেমন গোল, চৌকো, বরফি, ত্রিকোণ, পদ্মের পাপড়ির আকৃতি, কল্কা কখনো বা টানা পাড়ের মতো। আকৃতি আগে এঁকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিতে হয়, তারপর তার মধ্যে নকশা করা সহজ হয়ে ওঠে। এঁকে দেওয়া ছবি গুলি থেকে আশা করি প্রথম শিক্ষার্থীর বুঝে নিতে অসুবিধা হবে না। দেয় আলপনার নকশাগুলিতে ডবল লাইনের কাজ লক্ষণীয়। যেখানেই লম্বা লাইনের কাজ সেখানেই ডবল লাইনের প্রয়োজন, এতে নকশার সৌন্দর্য খুলে যায়। ডবল লাইনের অভাব নকশার সৌন্দর্যে হানি ঘটায়।